চতুর্থ অধ্যায়

মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্টতা

চতুর্থ অধ্যায়

মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্টতা

নারী ও পুরুষ এই দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে কেন্দ্র করেই একদিন সমাজ গড়ে উঠেছিল। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতায়, সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে মানব-সভ্যতা ক্রমবর্ধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সুতরাং সৃষ্টির শুভলগ্ন থেকেই তাদের সম্পর্ক নিগূঢ় রহস্যে আবৃত। বর্তমানেও আছে সেই রহস্য এবং পৃথিবী যতদিন থাকবে, মানব-জাতি যতদিন আছে উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের সেই জটিল রহস্যও ততদিন থাকবে। আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব – প্রাচীন যুগেও মুনি-ঋষিগণ এই মানব-মানবীকে কেন্দ্র করে নানা শাস্ত্র ও গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। মধ্যযুগের কবিরাও ধর্ম ও দেব মাহাত্ম্যের আড়ালে আসলে এই সমাজ সংসারে বিচরণকারী নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্কের বিচিত্র সমীকরণ ও তাদের জীবন জটিলতার নানা স্তরকেই তুলে ধরেছিলেন। আধুনিক সাহিত্যধারাতেও সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অবস্থানকারী নর-নারীর হৃদয়বৃত্তির টানাপোড়েন তথা সম্পর্কের গহন গভীর রহস্যময়তাকে বিভিন্ন সাহিত্যিকরা ভেদ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। সেই ধারায় বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের পটভূমিতে আবির্ভূত হয়ে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র আপন জীবনদর্শনের আলোকে মানব-মানবীর বহুমাত্রিক সম্পর্কের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরকে তাঁর কলমে খুঁটে খুঁটে তুলেছেন। এক্ষেত্রে বলা যায় – প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ তথা সাহিত্যিকের জীবন দর্শন গড়ে ওঠার মূলে থাকে তাঁদের নিজ নিজ পারিবারিক পরিবেশ-পরিমণ্ডল, ব্যক্তিত্ব ও জীবনবোধ। সেই অর্থে প্রত্যেকের রুচিবোধ, ভাবনা ও জীবনকে দেখবার ভঙ্গি পৃথক পৃথক। এই নিরিখেই প্রত্যেক শিল্পীর সৃষ্টি স্বতন্ত্রতা লাভ করে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানব-মানবীর সম্পর্কের বহুরূপতা ও জটিল দিকগুলিকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র কীভাবে উপন্যাস ও ছোটগল্পে নির্মাণ করেছেন তার বিশ্লেষণ পূর্বের দুটি অধ্যায়ে করা হয়েছে। তারই নিরিখে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য বর্ণনায় কোন্ বিশিষ্টতা ও নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা রইল এই অধ্যায়ে। মূল আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে কয়েকটি বিষয় আমরা বুঝে নেব –

প্রথমত, কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র ত্রিশ এর দশকের মাঝামাঝি সময়পর্বে সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব সমাজে তখনও প্রায় বহমান। পরবর্তী সময়ে সমাজে নেমে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা। যার প্রভাবে মানবজাতি জীবন-জিজ্ঞাসার

এক জটিল পর্বে এসে দাঁড়ায়। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অস্তিত্বের সংকট, বেকারত্ব, দেশ ভাগের বিপর্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলি যে যুগের জ্বলন্ত সমস্যা সেখানে দাঁড়িয়ে একজন সাহিত্যিকের পক্ষে যুগ-কালকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, নরেন্দ্রনাথ মিত্রও পারেননি। তবে সমকালীন লেখকবর্গের মাঝে জীবনকে দেখার বিশেষ আলোকের সূত্রেই তিনি স্বতন্ত্র মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক কথাশিল্পী সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুবোধ ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখের রচনায় সমাজের ভয়াবহ বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছিল। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অবক্ষয়িত সমাজের বীভৎস রূপের অভিজ্ঞতা তথা বোধটুকুকে গ্রহণ করে তাতে হৃদয়রস ঢেলে ভিন্নতর রূপে তাঁর রচনায় উপস্থাপন করছেন। ফলে রূঢ় বাস্তব দিকগুলির তুলনায় সেই বিষয়গুলি চরিত্রের মনোলোকে কেমন প্রতিক্রিয়া করে, মনের কারখানা কীভাবে আলোড়িত হয়, আহত মূল্যবোধের প্রকৃতি কেমন এবং তা চরিত্রগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করে এই দিকগুলিই রচনাতে মুখ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বস্তু জগতের তুলনায় মনোজগৎ বড় হয়ে ওঠে। তাই সমসাময়িক লেখকদের রচনায় প্রতিবাদ তীব্র আকার ধারণ করলেও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রতিবাদের ভাষা পৃথক, তিনি ততখানি নির্মম হতে পারেননি। আসলে লাজুক প্রকৃতির স্বল্পভাষী এই লেখক তাঁর অন্তরের আলোড়নকে কথাশিল্পের চরিত্রের অন্তরে সঞ্চারিত করেছিলেন, বাস্তব জীবনের বিরূপতা ও রূঢ়তাকে উপেক্ষা করে 'ভালোবাসা'-ই ছিল তাঁর সৃষ্টির মূল প্রেরণা শক্তি। মানব-মানবীর হৃদয় রহস্যের গভীরতম তাৎপর্য সন্ধানেই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। এটিই ছিল তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলী। এ প্রসঙ্গে লেখকের নিজের কথা তুলে ধরা যায় –"ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতি প্রেম সৌহৃদ্য, স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা, পারিবারিক গন্ডির ভিতর ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি। .....নিজের স্বভাবকে বুঝে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারা জীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা। তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।"[১] ফলে যুদ্ধোত্তর কালের চরিত্রগুলির মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পাশাপাশি উত্তরণ যেমন ঘটেছে তেমন এর বিপরীত দিকও পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে সে জন্য সামাজিক পরিস্থিতির প্রতি বিরূপতার তুলনায় চরিত্রগুলির প্রতি আমাদের পাঠকদের সহানুভূতিই জেগে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, লেখক তাঁর রচনার ক্ষেত্রভূমি প্রসঙ্গে বলেছেন – "সব লেখকই নিজের চেনাজানা গন্ডির ভিতর থেকে গল্পের উপাদান পেয়ে যান। আমিও তাদের ব্যতিক্রম নই।"[২] শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র ফরিদপুর গ্রামের সদরদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পড়াশুনা ও কর্মসূত্রে তিনি কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই শহরেই কাটান। কাজেই পূর্ববাংলার পল্লী প্রকৃতি, কলকাতা মহানগরী ও তার আশেপাশের মফঃস্বল শহর এই তিনটি ভূখন্ডই ছিল তাঁর চেনা সীমানা। সেই সূত্রেই তাঁর রচনায় গ্রামবাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বৃত্তির মানুষ – চাষি, মাঝি, মোল্লা, গাছি, ঢুলি, ভুঁইমালীরা যেমন উঠে এসেছে তেমন নাগরিক সভ্যতায় আগত মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা, কর্মমুখী নারীরা, অধ্যাপক, শিক্ষিকা, গায়িকা, নৃত্যশিল্পী প্রমুখ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এই চেনা জগতের চেনা মানুষের অচেনা সত্তার রহস্যেই লেখকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। মনোলোকের জটিলতাকে সহজ সরল ভাষায় তিনি উপস্থাপন করেন। আপাত দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনে ও মননে যে কত রহস্যের বীজ নিহিত আছে, জীবন জটিলতার নানা দিক সেখানে ক্রিয়া করেছে তা লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর কলমে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিপুল সাহিত্য সম্ভারের প্রত্যেকটি সৃষ্টিই তাই অনবদ্য। তার প্রত্যেকটির স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। আসলে মানব মনের প্রত্যেকটি স্তর ও তার বিভিন্ন অলি-গলিতে বহমান নানা হৃদয়রসের প্রকৃতি এবং স্রোতধারার গতি পরিবর্তনের কারণ তার পর্যবেক্ষণে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। কাজেই বৈচিত্র্যময় মানব সম্পর্কের ধারার বিচিত্র রহস্যকে উন্মোচন করা যে তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সেই সঙ্গে বলতে হয়, নর-নারীর সম্পর্কের বহুরূপতাকে তিনি যেভাবে তুলে এনেছেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ধারায় এমন দ্বিতীয় কোন শিল্পী আছে কিনা তাতে সন্দেহ থেকে যায়।

তৃতীয়ত, অভিনব লেখকের শিল্প সৃষ্টির ভাষা। ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে। একটি রচনার মূল উপাদান তথা প্রধান শক্তিই হল ভাষা। যার মাধ্যমে চরিত্রগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাদের মনের গতি-প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র খুব সহজ ও সাধারণ ভাষাকেই রচনাতে ব্যবহার করেছেন, ছোট ছোট বাক্য রচনা করে চরিত্রের মনের নানা অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন। সত্যি কথা বলতে, তাঁর ভাষার ব্যবহার আমাকে ভীষণভাবে বিস্মিত ও আকৃষ্ট করেছে। আমার এই গবেষণার কাজটি করতে গিয়ে মনে হয়েছে – লেখকের ভাষা শৈলী নিয়েই একটি গবেষণা প্রকল্প তৈরী করা যায়। দ্রুতগতিতে তাঁর রচনা সমূহ পড়তে পড়তে

একটা জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয় এবং পুনরায় সেখানে ফিরে গিয়ে বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে – জীবনের এত জটিল নিগূঢ় তত্ত্বকথাও এমন সহজ ভাষায় বলা যায়! জীবনকে গভীরভাবে জেনেছিলেন বলেই বোধহয় এমন স্বভাবিক সরল ভাষায় জীবনের রহস্যকে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর ভাষাশৈলী যে বাংলা সাহিত্যের ধারায় নতুন শৈলীর জন্ম দিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে – 'দেহমন' উপন্যাসে স্বামী যখন তার সমস্ত ভাবনা ও মতাদর্শের দ্বারা স্ত্রীকে গড়ে তুলতে চায় তখন তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় সে বিষয়ে লেখকের বর্ণনা – ''সংসারের খাওয়া-পরায়, শখ–আহ্লাদ, আমোদ-প্রমোদে সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারেও তার সেই বড় বড় কথাগুলিকে খাটাতে চেষ্টা করে। সেখানেই হয় বিপদ, সেখানেই শুরু হয় মতবিরোধ আর মনোমালিন্য। সংসারের দৈনন্দিন হাটবাজারের ছোট ছোট থলিতে অমন বড় বড় ভাব আর আদর্শ ধরবে কেন। ধরেও না। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যায়, ফেটে যায়।''[৩] কিংবা 'বর্ণবহ্নি' উপন্যাসের কাহিনীর শেষ পর্যায়ে উঠে আসে – ''মৃত্যু নিষ্ঠুর, কিন্তু জীবন নিষ্ঠুরতর।''[৪] আবার মানব সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর সহজ ব্যাখ্যা – নারী আর পুরুষের সম্পর্কের মত, ব্যষ্টি আর সমষ্টির সম্পর্কও বিচিত্র আর জটিল। সে সম্পর্ক পরিবারের মধ্যেই হোক, সমাজেই হোক, তার জটিলতা কোনদিনই উন্মোচিত হবে না। এক গিঁট খুলবে, আর একটি গিঁট পড়বে। যতদিন সমাজ আছে, সংস্কার আছে, এই গিঁট খোলা গিঁট বাঁধার পালা চলতেই থাকবে। কারণ এই গ্রন্থির মধ্যেই যত রস যত রহস্য। নর-নারীর সম্পর্কের রহস্য উন্মোচনে এই গিঁট খোলা এবং গিঁট বাঁধার প্রসঙ্গ তিনি বার বারই তুলে ধরেছেন। এমন অজস্র উদাহরণ তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতেই ছড়িয়ে আছে। তাঁর ভাষা শৈলী প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও বলেছেন – "একটা ব্যাপার খুব অবাক লাগত যে এত সুন্দর, সহজ সরল ভাষায় উনি কীভাবে গদ্য লিখতেন। গদ্য মানেই আমরা ভাবতাম কঠিন ভাষা, ভাষার মারপ্যাঁচ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় বুঝি। কিন্তু তাঁর গদ্যের ভাষা ছিল ব্যতিক্রম। ....এই ধরণের লেখা খুব কঠিন। তাঁর এই যে স্টাইলহীন রচনা এটাই একটা স্টাইল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"[৫] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এই কারণেই রবি ঠাকুরের কবিতার পংক্তি ও গান তিনি তাঁর রচনায় বার বার ব্যবহার করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি, রচনার ক্ষেত্রভূমি ও ভাষাশৈলীর বিশিষ্টতার এই দিকগুলি মাথায় রেখেই এবারে আমরা মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় তাঁর বিশিষ্টতা কতখানি তা খুঁজে নেব –

কিছু সম্পর্ক মানুষ জন্মসূত্রেই লাভ করে থাকে, বাকীগুলো জীবনের বিভিন্ন পর্বে গড়ে ওঠে। এ সকলের মধ্যে কিছু কিছু সম্পর্ক সমাজ স্বীকৃতি দেয় এবং এর বাইরে সমস্ত সম্পর্কই অবৈধ তথা পরকীয়া সম্পর্ক নামে পরিগণিত হয়। এই বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে মানব সম্পর্কে যে কত বিচিত্র, আবার একই সম্পর্কের ধারায় যে কত বর্ণময় তরঙ্গ উপস্থিত হয় তা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর এক একটি সৃষ্টিতে এক একভাবে তুলে ধরেছেন। দাম্পত্য সম্পর্ক একটি সমাজ অনুমোদন যুক্ত সম্পর্ক। তা একটি বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও কখনো তৃতীয় ব্যক্তির আগমন, অর্থ সংকট, প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাব কিংবা ভিন্ন রুচির দুটি মানুষের চাহিদাপূরণের খামতি সম্পর্কের জটিলতাকে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে দেয় তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক লেখক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব – সেখানে দু'জন দম্পতির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে একজন পুরুষের আগমনকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য সম্পর্কে বিপর্যয় নেমে আসে। পাশাপাশি স্ত্রীটি তার অজানা সত্তাকে আবিষ্কার করে। অর্থাৎ সে মাতৃত্ব লাভ করে। একদিকে সম্পর্কের টানাপোড়েন অপরদিকে মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণের তৃষ্ণায় স্ত্রীটি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বামীকে যখন বলে 'ওগো বাঁচাও'। তখন কোন্ হৃদয়রসের উৎসরণে স্বামী নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে বাঁচিয়ে তোলে এই দিকটিই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি কেমন হবে তা পরের প্রশ্ন। আবার 'দেহমন' উপন্যাসে দু'জন দম্পতির মধ্যে রুচি ও মানসিকতার বিস্তর পার্থক্য বর্তমান। সেখানে সম্পর্কের সূত্রে দু'জন মানুষ পরস্পরের শরীরকে স্পর্শ করলেও মন-এর সন্ধান পায় না। সেই পরিস্থিতিতে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে একটি নারী চরিত্রের অবতারণা করা হলে এই নারীটিকেই কেন্দ্র করে স্বামীর হৃদয়ানুভূতির জাগরণ ঘটে সমান্তরালে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। এমত পরিস্থিতিতে স্বামীর মনে নারীটিকে ঘিরে যখন নতুন করে সংসার করবার বাসনা জাগে তখন তার স্ত্রী স্বামীর হাত শক্ত করে চেপে ধরে। কাহিনীর প্রয়োজনে তৃতীয় নারী চরিত্রের প্রস্থান ঘটে। এই যে মনকে বাদ দিয়ে স্বামীটি সম্পর্কের বন্ধনে থেকে গেল সেই সম্পর্ক কতখানি সুস্থ-স্বাভাবিক থাকবে সে বিষয়েও সংশয় থেকে যায়। দাম্পত্য সম্পর্কের আর এক রূপ লেখক এখানে তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় চরিত্রগুলি যে দু'জন দম্পতির চলমান সম্পর্ককে কেবলমাত্র বিপর্যস্ত করে তোলে তা নয়, শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই চরিত্রগুলিকে কখনো কখনো অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করে সম্পর্কের ভিন্ন এক এক সমীকরণ উন্মোচিত করেছেন। আমরা যদি 'সঙ্গিনী' উপন্যাসে ফিরি

তাহলে সেখানে দেখব – সদ্য রোগমুক্ত একজন স্ত্রীর শারীরিক চাহিদার খামতিকে ঘিরে দাম্পত্য জীবনে একজন ভিন্ন রুচি সম্পন্ন অমার্জিত পুরুষের আগমন ঘটে। ফলস্বরূপ দাম্পত্য সম্পর্কটি জটিলতার চূড়ান্তে পৌঁছোলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়। তবে শরীরের টান ক্ষণস্থায়ী মনের টান চিরন্তন, শাশ্বত। এই তত্ত্বটুকু লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন। যার বশবর্তী হয়ে আইনগত দিক থেকে একটি সম্পর্কের ছেদ ঘটলেও স্ত্রীটি তার প্রাক্তন স্বামীর রোগশয্যায় ছুটে যায়। উভয়ে মনের সমস্ত মান-অভিমান ভুল বোঝাবুঝিকে ছাপিয়ে হৃদয়বৃত্তির গভীর টানাপোড়েনে পরস্পরকে আপন করে নেয়। অর্থাৎ সম্পর্কে শুধুমাত্র জটিল, সংকটময় রূপই থাকে তা নয়, মিষ্টি মধুরতাও যে আছে সেই দিকটিই ঔপন্যাসিক এখানে তুলে ধরেছেন। আবার চরিত্রের প্রবল উচ্চকাঙ্ক্ষা সম্পর্কের গতিধারাকে কোন্ পর্যায়ে উন্নীত করে তারই একটি দৃষ্টান্ত শিল্পী তুলে ধরেছেন 'জলপ্রপাত' উপন্যাসে। যেখানে স্ত্রী তীব্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে শেষ পর্যায়ে এসে অনুধাবন করে মনগত দিক দিয়ে স্বামীর থেকে সে অনেক দূরে সরে এসেছে। যে দূরত্ব তার পক্ষে ঘোচানো সম্ভব নয় বলে সে জলপ্রপাতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। অন্য দিকে আর একজন মানুষ যে পৃথিবীতে বেঁচে রইল তার মধ্যে থেকে যায় একদিকে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা অপরদিকে স্ত্রীর মনের মত করে নিজেকে গড়ে তুলতে না পারার যন্ত্রণা।

তবে শুধুমাত্র উপন্যাসেই নয়, কথাসাহিত্য বলতে আমরা উপন্যাস ও ছোটগল্প এই দুই শাখাকেই বুঝি। উপন্যাস জীবনের সমগ্রতার কথা বলে। ছোটগল্প জীবনের খন্ডাংশকে তুলে ধরে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনের অনুভূতিই এখানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আর এই অনুভূতিই এক একটি সম্পর্কের গতিপ্রকৃতির প্রধান নিয়ন্ত্রক। সেই সূত্রেই কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র নর-নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্কের বহুমাত্রিক রূপকে বিভিন্ন আলোকে তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত করেছেন। সেখানেই তাঁর শিল্প কুশলতার চরম উৎকর্ষতা ধরা পড়েছে।

উপন্যাসের মত ছোটগল্পেও দাম্পত্য সম্পর্কের পরতে পরতে থাকা নানা বাঁকগুলিকে যেভাবে শিল্পী চিনিয়েছেন তাতে পাঠকবর্গের ভাবনায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে দিয়েই তিনি পাঠক মনে স্বতন্ত্র মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়ে যান। আমরা যদি তাঁর 'সেতার' গল্পের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব – মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকটের ঘেরাটোপে আবদ্ধ এক গৃহবধূর অনুভবে পরিস্থিতির সাপেক্ষে ধরা পড়ে সমাজ সংসারে তার অবস্থান মূলত কোথায়। একদিকে তার নব আবিষ্কৃত শিল্পী-সত্তার টান অপরদিকে স্বামীর প্রতি কর্তব্য, দায়-দায়িত্বের টানাপোড়েনে উত্থিত হৃদয় যন্ত্রণা কেবল মাত্র সেতারের ঝংকারেই ধ্বনিত হয়নি, সেই অনুরণন পাঠক মনেও

সঞ্চারিত হয়েছে। কখন যেন চরিত্র ও পাঠক-এর সত্তা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এখানেই গল্পকারের কৃতিত্ব। আবার 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে স্ত্রী স্বামীর শিল্পসত্তাকে অনুধাবন করতে অক্ষম। এই ছিল স্বামীর মনের ক্ষোভ ও বিরূপতার মূল কারণ। সেই দিকটি তাদের নব দাম্পত্য সম্পর্কে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা লেখক একভাবে দেখিয়েছেন। আবার ঘটনাক্রমে স্ত্রীর মনে সৌন্দর্য চেতনা ও শিল্পবোধ জাগ্রত হলে স্বামীর কুৎসিত রূপ ও ব্যবহার তার মানসিকতাকে তিক্ত করে তোলে। ফলস্বরূপ তাদের সম্পর্ক আর একভাবে প্রভাবিত হয়। কাজেই মানসিকতার এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন একই সম্পর্কের ধারায় কত বিচিত্র তরঙ্গের সৃষ্টি করে সেই দিকটিই এখানে আর এক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই দাম্পত্য সম্পর্কের নানা স্তরকে এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবার ক্ষমতা বোধহয় নরেন্দ্রনাথ মিত্রই রাখেন।

চরিত্রের মনোবিকলন একটি দাম্পত্য সম্পর্ককে কতখানি ভয়াবহ করে তুলতে পারে তা 'জৈব' গল্পে প্রতিফলিত করেছেন কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। উত্তর ভারতের দাঙ্গার শিকারে স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার ঘটনায় স্বামীর মনে আঘাতের ছাপ তার আচরণে প্রকাশিত না হলেও সন্তানটির জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সন্তানটি তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপাদান হয়ে ওঠে। কাজেই সন্তানটিকে বিশেষ যত্ন করবার পাশাপাশি তাকে আদর-সোহাগ করতে করতে স্বামী সন্তানটির আচরণের নানা নোট নিতে থাকে। শুধু তাই নয়, একই মাতৃগর্ভে অন্যের ঔরসজাত সন্তানের সঙ্গে নিজের ঔরসজাত সন্তানের পার্থক্য কতখানি তার অনুসন্ধানেই সে স্ত্রীকে গর্ভবতী করে তোলে। মানসিকতার এক নিষ্ঠুরতম দিক এখানে উন্মোচিত হয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন নারীর স্ত্রী-সত্তার চরম দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ফলস্বরূপ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এক বীভৎস রূপ ধারণ করে। একজন শিল্পীর পর্যবেক্ষণ শক্তি কতখানি গভীর হলে এমন একটি সম্পর্কের প্রকৃতি চিত্রিত করা যায় তাই ভেবেই আমরা পাঠেকেরা বিস্মিত হই। লেখকের এমন নির্মাণ শক্তি জীবন সম্পর্কে নতুন করে আমাদের ভাবতে শেখায়। জীবনকে তথা সম্পর্ককে এমন নানা আলোকে দেখবার সূত্রেই কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র সমকালীন লেখকবর্গের মাঝে বিশিষ্ট স্থানলাভ করেছেন। আবার দাম্পত্য সম্পর্কের ধারায় প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য রসও যে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকে তা 'ঘাম' গল্পের মাধ্যমে লেখক উন্মোচিত করেছেন। এখানে তিনি শরীরের ঘামকে ঐ বাৎসল্য রসের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেখানে সচেতন ভাবে একদিকে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে অপরদিকে অবচেতন স্তরে স্বামীকে জড়িয়ে

ধরে স্ত্রীর তৃষিত মাতৃসত্তার বাৎসল্য রস ঘামের মাধ্যমে নিঃসৃত হয়েছে। মনের গহন স্তরে থাকা সূক্ষ্ম অনুভূতিকে এইভাবে সার্চ লাইটে তুলে এনে রাতের অন্ধকারে সচেতন মনে একরকম ও অবচেতন মনে আর এক বৈপরীত্যমূলক সম্পর্কের যে সমীকরণ লেখক এখানে টেনেছেন তার দ্বিতীয়টি সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যে আছে কিনা, সন্দেহ আছে। মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় তাঁর মৌলিকতা এখানেই। 'রস' গল্পে তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তবের খেজুর-রস বনাম জীবন-রসের উৎসরণ তিনি যেভাবে ঘটিয়েছেন, অভিনব সেই শিল্প কৌশল। ক্ষুন্নিবৃত্তি ও রূপজ-মোহ তথা যৌন প্রবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়রসের টানাপোড়েন এবং শেষ পর্যন্ত সেই হৃদয়বৃত্তিরই জয়গান ঘোষিত করা যা একটি সম্পর্কের মূল জিয়নকাঠি। এইভাবে সাধারণ বিষয় ভাবনার মধ্য দিয়ে জীবনের গূঢ় তত্ত্বকে ও সম্পর্কের বাঁধনের ভিত্তিমূলকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে তিনি যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবী রাখেন তা অনস্বীকার্য।

আবার নাগরিক সভ্যতার অর্থ সংকটের প্রেক্ষাপটে একজন গৃহবধূ যখন চাকরি করতে বাধ্য হয় তখন তাকে যেমন পারিবারিক নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তেমন দাম্পত্য জীবনেও নেমে আসে বিপর্যয়। আবার মূল্যবোধের জায়গা থেকে সেই চাকরি ছেড়ে সম্পর্ক আর একভাবে সংকটাপন্ন হয়। এই বিষয়টিকে প্লট বিন্যাসের দক্ষতায় লেখক যেভাবে পরিবেশিত করেছেন তা শুধুমাত্র তৎকালীন নয়, বর্তমান একবিংশ শতকের পটভূমিকাতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এখানেই লেখক তাঁর যুগ-কালকে অতিক্রম করে সার্বভৌমত্ব লাভ করেন। অন্যদিকে একজন স্বল্প দৈর্ঘ্যের অধিকারী অর্থাৎ বামন আকৃতির পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের একজন নারী বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে সেই সম্পর্কের গতি তিক্ততার কোন্ পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে তার একটি দিক ধরা পড়েছে 'দম্পতি' গল্পে। লেখনী শক্তি কতখানি তীক্ষ্ণ হলে এমন সম্পর্কের জাল বয়ন করা যায় তার একমাত্র উদাহরণ বোধহয় কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রই। আবার আমরা যদি তাঁর 'বিলম্বিত লয়' গল্পে ফিরে আসি তাহলে দেখব দু'জন শিল্পী মানুষ দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকেই আপন শিল্প সত্তাকে প্রাধান্য দিতে গেলে চলমান সম্পর্ক স্বাভাবিকাকে হারিয়ে জটিলতার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছোয়। এমত পরিস্থিতিতে দুটি সত্তার এক বিশেষ মানবিক উত্তরণ ঘটানোর মাধ্যমে গল্পকার তাদেরকে পুনরায় এক মধুর সম্পর্কের সূত্রে গ্রথিত করেন। যা পাঠক মনকে আর এক ভাবে নাড়া দেয়। এইভাবেই দাম্পত্য সম্পর্কের বিকারগ্রস্ত নারকীয় দিক, তিক্ত বিদ্বেষে জর্জর, অবেগ-উচ্ছ্বাসে উদারতায় অনাবিল তথা স্নিগ্ধ মধুরতারও নানা দিক কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর অজস্র ছোটগল্পে প্রতিফলিত করেছেন।

যেগুলি তাঁর শিল্পকুশলতারই মৌলিক স্মারক চিহ্নস্বরূপ। আসলে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র সাধারণ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে অসাধারণত্বের সন্ধানেই যে ব্রতী হয়েছিলেন তা তাঁর গল্পগুলির নামকরণই প্রমাণ দেয় – 'সেতার', 'শাল', 'এক পো দুধ', 'আয়না', 'সুহাসিনী তরল আলতা', 'বেহালা' ইত্যাদি। এই ছিল তাঁর নিজস্ব শিল্পশৈলী।

তবে শুধুমাত্র দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, এর বাইরেও বিভিন্ন নামহীন, লিখিত-অলিখিত সম্পর্ক জীবনের চলার পথে এসে ভিড় করে। জীবনে এদের স্থায়িত্ব যতটুকু সময়ের জন্যই হোক না কেন, তা ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির রসে জীবনকে সিক্ত করে তোলে। ফলে এদের অস্তিত্ব কখনোই অস্বীকার করা যায় না। এরকম বিভিন্ন সম্পর্কের রূপরেখা কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্লট গঠন, কাহিনী নির্মাণ, বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং চরিত্র চিত্রায়নের বিশেষ দক্ষতার মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে তাঁর কথাসাহিত্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। এমন নির্মাণ ক্ষমতার মধ্য দিয়েই তাঁর বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে। বিবাহ পূর্ববর্তী জীবনে আগত বিচিত্র সম্পর্ককে তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন সেদিকে যদি আমরা চোখ রাখি তবে লেখকের জীবন দর্শনের নানা দিককে খুঁজে পাব। ফিরে যাই তাঁর 'টর্চ' গল্পে। সেখানে টর্চের আলো ফেলবার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মনের অনুভূতির ভিন্নতাকে যেভাবে লেখক দেখিয়েছেন এবং প্রেমিক পুরুষের মনের এমন রূপান্তরকে কেন্দ্র করে এক নারীর হৃদয় যন্ত্রণাকে যেভাবে তুলে এনেছেন তা কেবলমাত্র পাঠকবর্গকে বিস্মিতই করে না, জীবনাভিজ্ঞতায় এক নতুন মাত্রা সঞ্চারিত করে। মানব-মানবীর সম্পর্কের এক রকম ধারা যেমন এই গল্পে উঠে এসেছে তেমন 'চা' গল্পে আর এক রূপ ধরা পড়েছে। চা একটি নিত্য-প্রয়োজনীয় পানীয় বিশেষ। লেখক এই চা-এর ফ্লেভারের মধ্যে একটি চরিত্রের আর্থিক সঙ্গতি-অসঙ্গতির ওঠা-পড়ার দিকটি তুলে ধরেছেন এবং একে কেন্দ্র করেই অপর একটি চরিত্রের অনু ভূতির রূপান্তরকে বিশেষভাবে চিত্রিত করেছেন। যার মধ্য দিয়ে দুটি নর-নারীর সম্পর্কের এক ভিন্ন সমীকরণ রচিত হয়েছে। চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে জীবনের চলমানতার যুক্তি জাল বয়ন করতে করতে লেখক এক এক সময় যে চমক সৃষ্টি করেন তা আসলে বাস্তব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। তবে তা আমাদের পাঠকের কাছে নতুন লাগে এবং এই নতুনত্বকে গ্রহণের মধ্য দিয়েই লেখক আমাদের হৃদয়ের মাঝে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নেন। এই দুটি গল্পের পাশাপাশি 'ছদ্মনাম' গল্পটি স্মরণ করা যায়। যেখানে বিশেষ আবেগানুভূতিকে ঘিরেই দু'জন যুবক-যুবতী একটি প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ হলেও পারিবারিক দায়-দায়িত্ব তাদের জীবনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, ফলে সম্পর্কটি জটিল পর্যায়ে পৌঁছোয়। কিন্তু সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত ছদ্মনামের

আড়ালে তাদের সেই হারানো সম্পর্ককে তারা আর একভাবে খুঁজে পায়। আবার 'থিম' হিসাবে প্রায় একই বিষয় গ্রহণ করলেও সম্পর্কের আর এক প্রকৃতিকে উন্মোচিত করেছেন গল্পকার তাঁর 'বোধন' গল্পে। সেখানেও পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালনের ব্যস্ততায় এক নারীর কাছে নিজ জীবনের দাবী গৌণ হয়ে ওঠে। তবে জীবনের এক পর্বে এসে তার থেকে বয়সে কম এক সুদর্শন যুবকের সান্নিধ্যে নারীটির অতৃপ্ত উপবাসী কুমারী মন পুনরায় জেগে ওঠে। পুরুষটিকে কেন্দ্র করেই তার নারীসত্তার বোধন ঘটে। অপরদিকে বলা যায় – একটি সম্পর্ককে ঘিরে দু'জন মানুষ তাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চায়। কিন্তু সম্পর্কটি যদি দীর্ঘদিন একই জায়গায় রয়ে যায় এবং মনের আশা বার বার ভঙ্গ হতে থাকে তবে একসময় সেই সম্পর্কটি একঘেয়ে হয়ে ওঠে। ফলে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার এক তীব্র বাসনা মনে জেগে ওঠে। কিন্তু মুক্তি লাভের পরেও সম্পর্কটির সঙ্গে জড়ানো বিশেষ হৃদয়ানুভূতির বশেই বার বার সেই সম্পর্কেই ফিরে যেতে হয়। সম্পর্কতত্ত্বের এই গভীরতম দিকটি 'অভিসার' গল্পে একজন রোগগ্রস্ত পুরুষ ও একজন সুস্থ-স্বাভাবিক নারী চরিত্রের মাধ্যমে লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শুধুমাত্র ছোটগল্পে নয়, আমরা যদি তাঁর উপন্যাসগুলি স্মরণ করি তাহলে সেখানেও দেখব – বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ও বহু চরিত্রের সমাবেশে মানব-মানবীর বহুমাত্রিক সম্পর্ক ধারার নানা পর্যায়কে তিনি উপস্থাপন করেছেন। এই সম্পর্কগুলির প্রকৃতি কেবলমাত্র আমাদের মনে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয় তা নয়, জীবন আসলে কীরূপ তা চেনাতে সাহায্য করে। শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সার্থকতা এখানেই। শরীর ও মন এই দুই এর মিলনেই একটি সম্পর্ক পূর্ণতা পায়। মানব সম্পর্কের এই নিগূঢ় তত্ত্বকথাকে 'পরম্পরা' উপন্যাসে একটি নারীর সঙ্গে দুই অসম-বয়সী পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একজন শিল্পীর জীবন দৃষ্টি কতখানি প্রখর হলেই এমন তত্ত্বকথাকে চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায় তা ভেবেই আমরা পাঠকেরা চমকিত হই। এই 'পরম্পরা' উপন্যাসের প্লট বিন্যাস সর্বোপরি যে কাহিনী নির্মাণ কৌশল তা সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বোধহয় প্রথম প্রয়াস। অন্যদিকে একজন প্রেমিক পুরুষ বয়সের কোন্ ধর্মে তার ভালোলাগার পাত্রীকে ধর্ষণ পর্যন্ত করতে পারে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কের প্রকৃতি কীরূপ হতে পারে তারই এক পরীক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হিসাবে ঔপন্যাসিকের 'শুক্লপক্ষ' উপন্যাসটি এখানে স্মরণ করা যায়। আকস্মিকতাকে গ্রহণ করাই জীবনের ধর্ম। এর ফলে জীবন-সম্পৃক্ত সম্পর্কগুলি কীভাবে প্রভাবিত হয় সেই দিকটিই সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র এখানে উন্মোচিত করেছেন। তবে কাহিনীর প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ

ধর্ষক পুরুষের প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকলেও শেষ পর্বে তার প্রতি আমাদের পাঠকদের মনে সহানুভূতিই জেগে ওঠে। এই যে এমন একটি বিষয় নির্বাচন করে কেবলমাত্র সম্পর্কের গতি-প্রকৃতিই নয়, পাঠকমনের অনুভূতির এমন রূপান্তরের সার্থক শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রই। এখানেই তাঁর মৌলিকতা।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লেখকের বহু উপন্যাস ও ছোটগল্পেই দেখেছি বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি মানব সম্পর্কের বর্ণময় দিককে তুলে ধরেছেন। সেরকমই একটি উপন্যাস 'মৌন মাধুরী', এখানে বিশেষভাবেই এটির উল্লেখ করতে হয়। এই উপন্যাসে এক বাক্‌শক্তিসম্পন্ন নারীর সঙ্গে বাক্‌শক্তিহীন এক পুরুষের সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে। একটি মূক চরিত্রের গভীর হৃদয়ানুভূতি ঔপন্যাসিক এখানে যেভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন তা এককথায় অনবদ্য। অসাধারণ তাঁর চরিত্র নির্মাণ ক্ষমতা। লক্ষণীয়, ঐ পুরুষ হৃদয়ের গভীর আবেগ-উচ্ছ্বাস কেবলমাত্র নারী চরিত্রটির অন্তর্জগতকেই আলোড়িত করেছে তা নয়, পাঠক চিত্তেও তা সঞ্চারিত হয়েছে। এই বাক্‌শক্তিহীন মানুষটির মুখরিত অন্তরসত্তার সঙ্গে আমরা পাঠকেরা কখন যেন মিলেমিশে একাত্ম হয়ে উঠি। দাম্পত্য কিংবা বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্কই নয়, কোন বিধবা নারী বা বিপত্নীক পুরুষ তাদের জীবনের দাবীকে স্বীকার করে পুনরায় কোন সম্পর্কে আবদ্ধ হলে সেখানেও যে জটিলতার কত বিচিত্র দিক আপন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন 'মহাশ্বেতা' গল্পে একজন বিধবা রমণীর মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির টানাপোড়েন অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে তুলে এনে লেখক যেভাবে কাহিনী নির্মাণ করেছেন তা এক কথায় অসাধারণ। অনুভূতির বিপরীত স্রোত এখানে একটি চরিত্রকে তথা একটি সম্পর্ককে পরিচালিত করেছে। অথচ বাইরে সেভাবে প্রকাশিত না হলেও একটি নারীর মনের কারখানা যেভাবে আলোড়িত হয়েছে তা তুলে আনার এমন কৌশল ও উপমার প্রয়োগ তা বোধহয় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পক্ষেই সম্ভব। আবার তিনি এই বিধবা নারীদেরই জীবন-যন্ত্রণাকে 'পুনর্ভবা', 'যবনিকা', 'ক্ষতিপূরণ' ইত্যাদি গল্পে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। তার অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। কেবলমাত্র প্রেম, প্রীতি, অনুরাগ নয়, লালসা, আসক্তি, কামনার বশবর্তী হয়ে নারী বা পুরুষ শারীরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হলে সেই সম্পর্ক শরীর থেকে যখন মনে সঞ্চারিত হয় তখন তার যে কত বিচিত্র রূপ তা লেখক 'কুমার সম্ভব', 'মদনভস্ম' ইত্যাদি গল্প অবলম্বনে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর এমন নির্মাণ কৌশল ও পর্যবেক্ষণ শক্তি আমাদের চমকিত করে।

সুতরাং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রত্যেক স্রষ্টাই মানব-জীবনকে কেন্দ্র করে

সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন। কাজেই সেখানে যে মানব-মানবীর সম্পর্কের বিভিন্ন বাতাবরণ থাকে তা বলাই বাহাল্য। এই একই বিষয় নিয়ে যুগ যুগ ধরে সাহিত্য রচিত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তবে বিভিন্ন যুগ-কালে আবির্ভূত সাহিত্যিকবৃন্দ আপন জীবন-দৃষ্টির আলোকে, বিশিষ্টতার সূত্রেই এই মানবজীবন ও সম্পর্ককে এক একভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই সাহিত্য অঙ্গনে স্ব স্ব মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। একজন শিল্পী হিসাবে নরেন্দ্রনাথ মিত্রও তার ব্যতিক্রম নন। এখানে আমাদের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি বিষয়ই বার বার উঠে এসেছে যে – লেখক তাঁর রচনার উপাদান খুঁজতে কখনোই চেনা সীমানার বাইরে যাননি। এ প্রসঙ্গে 'পুরাতনী' নামক একটি গল্পে চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর যে মতাদর্শ উঠে এসেছে তা এখানে বিশেষ স্মরণীয় – "নতুন দেশের স্বাদ ঘরের কোণে বসে মেলে না। সেকথা আমি মনে মনে মানি। কিন্তু মুখে স্বীকার করিনে। বলি, মনোরথের তুল্য রথ নেই। বলি, সবচেয়ে দূর আর দুর্গম হল বন্ধুজনের অন্তরদেশ। আমার দেশান্তরে যাওয়ার দরকার কী।"[৬] লক্ষণীয় এখানে 'অন্তরদেশ' শব্দটি। মানুষের মনের গহন গভীরে যে অলি-গলি রয়েছে সেখানে লেখক অনায়াসেই প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখানকার গোপন রহস্যই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কাজেই মনের নানা কুঠুরিতে যে হৃদয়রসের জোয়ার-ভাঁটা সংঘটিত হয় তা স্পষ্ট হয়ে কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মর্মভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এই 'হৃদয় রস'ই তাঁর রচনার মূল উপাদান। মানব মনের এই অনুভূতির উপর মানব সম্পর্কগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই অন্তররসকে কেন্দ্র করেই নিজ শিল্পদক্ষতার মাধ্যমে সম্পর্কের এমন নানা গতিধারা ও তার উত্থান-পতনের বিভিন্ন দিককে তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। মানব-হৃদয়ের রহস্য লেখকের কাছে সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়েছিল বলেই দু'একটি কথার মাধ্যমেই চরিত্রগুলিকে এমন স্পষ্ট করে চিত্রিত করতে তিনি পেরেছিলেন। এক একটি চরিত্রকে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবার আশ্চর্য শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। লক্ষণীয়, তাঁর রচনায় নায়ক-নায়িকা তথাকথিত সুন্দর রূপ-গুণের অধিকারী নয়। বাস্তবের সাধারণ মানুষগুলিই সেখানে হুবহু উঠে এসেছে। শুধু চরিত্র নয়, সাধারণ বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে অসাধারণত্বকে তুলে আনাই ছিল তাঁর Style। এর সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে তিনি সাধারণ ভাষাকেই রচনায় ব্যবহার করেছেন। এই হল সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্টতা বা মৌলিকতা। এর গুণেই চার দশক ধরে সমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে তিনি প্রায় চার'শোর কাছাকাছি ছোটগল্প ও ছোট বড় মিলিয়ে আটান্নটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। যার প্রত্যেকটিতেই মানব সম্পর্কের বিচিত্র দিক ধরা পড়েছে। যার

প্রত্যেকটিই অনন্য সাধারণ। যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ বৈচিত্র্যে পাঠকচিত্ত আলাদা মাত্রা লাভ করেছে। মানব-মানবীর সম্পর্কের প্রকৃতি তিনি যেভাবে তুলে এনেছেন এবং সম্পর্ক তত্ত্বের ব্যাখ্যা চরিত্রগুলির মাধ্যমে যেভাবে প্রাঞ্জল সহজ সাধারণ ভাবে উপস্থাপন করেছেন তা আজ একবিংশ শতাব্দীতে সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ বর্তমান যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায় নিত্য নতুন প্রযুক্তির সহায়তায় নিঃসঙ্গতা, হতাশা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সমকামিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি জীবনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে শুধু তাই নয়, পরকীয়া সম্পর্কের প্রতি এক অদম্য আকর্ষণে বিকারগ্রস্ত মানুষ হত্যালীলায় মগ্ন হচ্ছে। বর্তমান সমাজ-জীবনের এই দিকগুলির কারণও আমরা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিভিন্ন সৃষ্টিতে সম্পর্কতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা উঠে এসেছে তার মধ্যেও খুঁজে পাব। তবে দুঃখের বিষয় এখানেই, এমন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মানুষটি সাহিত্যক্ষেত্রে যেন অনেকবেশি অবহেলিত ও বঞ্চিত রয়ে গিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। গল্প লেখার গল্প, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১১

২। ঐ, পৃঃ ১০

৩। দেহমন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল-২০০৪, ২য় মুদ্রণ জুলাই-২০০৯, পৃঃ ১০৫

৪। বর্ণবহ্নি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী-২০১১, পৃঃ ৮৫৬

৫। সম্পাদকীয়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা – উজাগর, সম্পাদক উত্তর পুরোকাইত, উজাগর প্রকাশন, শিবানন্দ ধাম সিজবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া হাওড়া, পৃঃ ৮

৬। পুরাতনী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ৩৭৫